মতে বিশ্বের সমস্ত পদার্থেরই আত্মোপলব্ধির অর্থ আছে। তাদের প্রত্যাশিত পরিণাম কল্পনা করা সম্ভব। অবশ্য মানুষের ক্ষেত্রে আত্মোপলব্ধির যে গভীর তাৎপর্য আছে প্রজাতি বা বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে সেই তাৎপর্য থাকা স্বাভাবিক নয়। তবুও তাদেরও অস্তিত্বের কিছু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে যা তাদের উপলব্ধির বিষয় হতে পারে।

কিন্তু এ কথা স্বীকার করা সহজ নয়। উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে অনেকেই কষ্টকল্পনা বলে মনে করবেন। যে অর্থে একজন মানুষের অস্তিত্বের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে, তার আত্মোপলব্ধির অর্থ আছে সেই অর্থে বাস্তুতন্ত্রের বা তার অন্তর্গত জড়বস্তুর অস্তিত্বের উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না। একজন সচেতন প্রাণীর আত্মোপলব্ধির কথা বলা অর্থহীন নয়, কিন্তু উদ্ভিদজগৎ বা প্রজাতি বা সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের আত্মোপলব্ধির কি অর্থ থাকতে পারে? 'আত্মোপলব্ধি' শব্দটি একটি আদর্শের উপলব্ধিকে বোঝায় এবং সেই উপলব্ধির জন্য চাই চেতনা যা জড় জগতে বা প্রজাতির ধারণার মধ্যে অনুপস্থিত। তাই সামগ্রিকভাবে বাস্তুতন্ত্রের নৈতিক মর্যাদার প্রশ্ন ওঠে না। নৈতিক মর্যাদার সীমা যেন মানবজগতের মধ্যেই শেষ হয়েছে।

সামাজিক বাস্তুবিদ্যা

Deep Ecology বা গভীর বাস্তুবিদ্যা যে সমস্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তার অনেকটাই বিমূর্ত। যেমন, এই মতবাদে আমাদের বিশ্বদৃষ্টির (world view) পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। আমাদের বিশ্বদৃষ্টি অতি সঙ্কীর্ণ এবং তার জন্যই আমরা নিজেদের পরিবেশের প্রভু বলে মনে করি এবং প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করতে পারি না। এই দৃষ্টির পরিবর্তন আবশ্যক। সামাজিক বাস্তুবিদ্ মনে করেন যে বিমূর্ত বিশ্বদৃষ্টি পরিবেশের সঙ্কটের কারণ নয়। পরিবেশের সঙ্কটের কারণটি সামাজিক (social)।

'Social Ecology' বা 'সামাজিক বাস্তুবিদ্যা' শব্দটি Murray Bookchin নামক একজন আমেরিকান দার্শনিক সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। তিনি তাঁর চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন কমিউনিজমের উদ্গাতা কার্ল মার্কসের (Karl Marx) দ্বারা। নৈরাজ্যবাদী দর্শনও (Anarchism) তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এই দুই দর্শনের প্রভাবে Bookchin বলেছিলেন যে পরিবেশগত সমস্যার মূল কারণ রয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে। অধিকাংশ সমাজেই এক শ্রেণীর মানুষ অপর এক শ্রেণীর মানুষের উপর প্রভুত্ব করে। তার ফলে এক শ্রেণীর মানুষ অন্য এক শ্রেণীর মানুষের দ্বারা অবদমিত হয়। সমাজ এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। একটি শ্রেণী অপর একটি শ্রেণীর তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে

করে— যেমন, পুরুষ জাতি নিজেকে নারীজাতির তুলনায় উচ্চস্তরের বলে মনে করে; বৌদ্ধিক দক্ষতাকে শারীরিক দক্ষতার তুলনায় উন্নত বলে মনে করা হয়। সমাজে এই স্তরভেদ থাকার ফলে শুধু যে তথাকথিত উচ্চস্তরের মানুষ নিম্নস্তরের মানুষকে অবদমন করেছে তা নয়, মানুষ প্রকৃতিকেও তার তুলনায় নিম্নস্তরের বলে মনে করেছে এবং তাকে শোষণ করেছে। অবদমন করা এবং শোষণ কারই সমাজের ধর্ম। সমাজের এই চিত্র আমাদের চিন্তা ও জীবনকে প্রভাবিত করেছে। শোষণ ও অবদমন প্রকৃতির রাজ্যেও সংক্রামিত হয়েছে।

সুতরাং Brookchin-এর মতে পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমে মানুষেব সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের পরিবর্তন প্রয়োজন। সমাজে কোন শ্রেণী উচ্চ নয়, কোন শ্রেণী নীচ নয়। সমাজে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলে প্রভুত্ব ও শোষণের অবসান হবে। মানুষ নিজেকে প্রকৃতির প্রভু বলে মনে করবে না। আমরা নিজেদের উচ্চশ্রেণীর বলে মনে করি বলেই পরিবেশকে দূষিত করতে বা ধ্বংস করতে দ্বিধা করি না।

ভারতীয় দর্শনে পরিবেশ নীতিবিদ্যা

পরিবেশ নীতিবিদ্যা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে পাশ্চাত্য দর্শনে আত্মপ্রকাশ করেছে মাত্র কিছুদিন আগে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে পরিবেশ-চিন্তা যে অত্যন্ত গভীরভাবে উপস্থিত ছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বেদ ও উপনিষদ যে তত্ত্বজ্ঞান দান করেছে সেই তত্ত্বের নাম চৈতন্যতত্ত্ব। এই চৈতন্য যা ব্রহ্ম বা আত্মা বা কখনও ঈশ্বর নামে প্রচারিত হয়েছে তা জগতের অতিবর্তী সত্তা নয়। ভারতীয় দর্শনে যা তত্ত্ব তা জগৎকে উপেক্ষা করে না। বরং যা ঈশ্বর নামে কথিত হয়েছে তা এই বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। **ঈশোপনিষদে** বলা হয়েছে— 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।' এই জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

এ কথার তাৎপর্য অতি গভীর। যে চৈতন্যময় ঈশ্বর মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সেই ঈশ্বরই জলে-স্থলে-অরণ্যে-অন্তরীক্ষে বিরাজমান। এই বোধ সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। ভারতীয় দার্শনিকের কাছে প্রকৃতি জড়জগৎ নয়, বরং একই ঈশ্বরের উপস্থিতিতে স্পন্দিত। এই ঈশ্বর আমাকেও চৈতন্যময় করেছে। এই বোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই বৈচিত্র্যময় বিশ্ব একটি অখণ্ড নীড়ে পরিণত হয়েছে যা সকলের আশ্রয়। ভারতীয় দর্শনের-এ এক অভিনব বাস্তুতন্ত্র যা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বা বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং উপলব্ধির ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত

এক অধিবিদ্যা। পাশ্চাত্য দর্শন তার পরিবেশ চিন্তায় ব্যবহার করেছে বুদ্ধিকে; ভারতীয় দর্শনের পরিবেশ চিন্তার ভিত্তি উপলব্ধি।

ভারতীয় দর্শন প্রধানত উপলব্ধিভিত্তিক। উদার প্রকৃতির আসনে যে সাধক তত্ত্বলাভের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন তাঁর উপলব্ধিতে সমগ্র বিশ্বের একত্ব এবং ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপলব্ধির আলোকে সাধক দেখেছিলেন যে সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের স্পর্শে প্রাণবান। উপনিষদের ঋষি তাই ঘোষণা করেছিলেন যে যিনি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, পত্রে, পুষ্পে, বনস্পতিতে বিরাজমান তিনি আমাদের পূজ্য এবং তাঁর স্পর্শে সমগ্র বিশ্ব চরাচর আমাদের পূজ্য হয়ে ওঠে।

পাশ্চাত্য দর্শন কখনও কখনও এই বোধে উদ্দীপ্ত হয়েছে। কিন্তু তাকে যুক্তিনিষ্ঠ করার প্রচেষ্টা অনিবার্যভাবে ব্যর্থ হয়েছে। উপলব্ধির সত্যতা অমোঘ, তা যুক্তির মানদণ্ডকে স্বীকার করে না। ভারতীয় দর্শন অবশ্য মননকে প্রত্যাখ্যান করেনি। ভারতীয় দর্শনে মনন উপলব্ধিকে অনুসরণ করেছে, নিজেকে উপলব্ধির প্রভু করে তোলেনি।

যে বোধের আলোকে সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বরময় বলে মনে হয় সেই বোধ থেকে প্রকৃতির ক্ষতিসাধন করা সম্ভব নয়। মানুষ যখনই প্রকৃতিকে জড় বলে মনে করে তখনই তার মনে প্রভুত্বের লালসা জাগে। তখনই সে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে যে প্রকৃতিকে সে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে, তাকে ধ্বংস করতে বা দূষিত করতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের দর্শন চিন্তায় মানুষ প্রকৃতির প্রভু নয়; প্রকৃতি মানুষের অধিকৃত সম্পত্তি নয়। যে পরমসত্তা প্রতিটি মানুষে বিধৃত হয়ে আছে তাই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই আত্মিক বন্ধনকে ভারতবর্ষের পরিবেশ নীতিবিদ্যার ভিত্তি বলা চলে। প্রকৃতিকে ভারতীয় দার্শনিক শুধু সংরক্ষণ করেননি, তাকে শ্রদ্ধা করেছেন।

Leopold-এর 'Land Ethic'-এর ধারণাকে অনেকেই ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে আবিষ্কার করতে পারেন। তবে সেই ধারণার ভারতীয়ত্ব পাশ্চাত্য চিন্তায় থাকতে পারে না। ভারতবর্ষে পৃথিবীকে সকল বস্তুর জীবনীশক্তির উৎস বলা হয়েছে। পৃথিবী তাই ভারতীয়দের কাছে 'মাতা ধরিত্রী'। এই মাতৃ উপমা পৃথিবীর ধারণায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে যা পাশ্চাত্যের ধারণায় বিরল। প্রাচ্যের এই মাতৃকল্পনায় বিশ্বের প্রতি আমাদের আত্মীয়তা প্রকাশিত হয়েছে। মাতাকে সন্তান যেমন সযত্নে রক্ষা করে সেইরকম মানুষও মনে করে যে মাতা বসুন্ধরাকে সযত্নে সংরক্ষণ করা তার কর্তব্য।

এই মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রকৃতির প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতাবোধ। মানুষ তার জন্মলগ্ন থেকেই নানাভাবে ঋণী। মনুসংহিতায় মানুষের ঋণত্রয় বা ত্রিবিধ ঋণের উল্লেখ আছে। মানুষ মাত্রই ঈশ্বরের কাছে, ঋষিদের কাছে এবং পূর্বপুরুষের

কাছে ঋণে আবদ্ধ। যাগযজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন এবং সন্তান প্রতিপালনের মাধ্যমে মানুষ এই ত্রিবিধ ঋণ শোধ করে। মানুষ যে শুধুমাত্র পারত্রিক বিষয়ের প্রতি ঋণে আবদ্ধ তা নয়। সে তার ঐহিক আশ্রয়ের প্রতিও একইরকম ঋণে আবদ্ধ। ভূ-ঋণকে তাই মানুষের চতুর্থ ঋণ বলে গণ্য করা হয়েছে মহাভারতে। মানুষ এই বিশ্বপ্রকৃতির কাছে নানাভাবে ঋণী। এই ঋণ পরিশোধ করার জন্য মানুষের উচিত প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা, তাকে সশ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় লালন পালন করা। এর দ্বারাই সকলের কল্যাণ সাধিত হতে পারে।

ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিবেশ নীতিবিদ্যাকে কখনও কখনও ঋণের ধারণার মাধ্যমে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষ শুধু গ্রহীতা হতে পারে না। গ্রহণ মানুষের মধ্যে দায়বদ্ধতার জন্ম দেয়। এই দায়বদ্ধতাই পরিবেশের প্রতি তার নৈতিক দায়িত্বের ভিত্তি।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় ভারতবর্ষের এই বিশ্বমৈত্রীর দর্শন নতুন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'তপোবন' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন:

> "মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায়, তা হলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশঃ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে যায়।
>
> ভারতবর্ষ তার জীবনে প্রকৃতিকে আহ্বান করেছে এবং যোগসাধনায় ব্রতী হয়েছে। যোগসাধনার অর্থ জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে আমরা মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারি। এরই নাম বিশ্বজাগতিকতা। এই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।... ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈত, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।"

এই বিশ্বজাগতিকতার বন্দনা উচ্চারিত হয়েছে '**শ্বেতাশ্বেতর**' উপনিষদে—

> "যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিসে। য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।"

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি। এই জগৎ শুধুমাত্র আমাদের ব্যবহারের বস্তু নয়। যা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে তার ব্যবহারিক মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু তার অন্য কোন উদার তাৎপর্য নেই। "বিশ্বব্যাপী" শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "যে জিনিষকে আমরা সর্বদাই ব্যবহার করি, যাতে আমাদের প্রয়োজন সাধন

হয়, আমাদের কাছে তার তাৎপর্য অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। স্বার্থ জিনিসটা যে কেবল নিজে ক্ষুদ্র তা নয়, যার প্রতি সে হস্তক্ষেপ করে, তাকেও ক্ষুদ্র করে তোলে। এমনকি, যে মানুষকে আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগাই, সে আমাদের কাছে তার মানবত্ব পরিহার করে বিশেষ যন্ত্রের শামিল হয়ে ওঠে। কেরানি তার আপিসের মনিবের কাছে প্রধানতঃ যন্ত্র, রাজার কাছে সৈন্যরা যন্ত্র, যে চাষা আমাদের অন্নের সংস্থান করে দেয় সে সজীব লাঙল বললেই হয়। ... জগৎকে আমরা অত্যন্ত ব্যবহারের সামগ্রী করে তুলেছি। এইজন্য তার জল-স্থল-বাতাসকে আমরা অবজ্ঞা করি— তাদের আমরা অহংকৃত হয়ে ভৃত্য বলি এবং জগৎ আমাদের কাছে একটা যন্ত্র হয়ে ওঠে।"

প্রকৃতি বা পরিবেশ আমাদের ব্যবহারের যন্ত্রমাত্র নয়। আমাদের প্রয়োজনের সাধক বলেই প্রকৃতি মূল্যবান নয়। প্রকৃতি ঈশ্বরের দ্বারা প্লাবিত। ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন এই বোধ আমাদের বিশ্বের প্রতি মৈত্রীভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে।